১৭

তফসিলী অঞ্চল ও উপজাতি অঞ্চলের প্রশাসন

সংবিধানে অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে 'তফসিলী অঞ্চল' বলে অভিহিত কতকগুলি অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, যদিও এই অঞ্চলগুলি কোনো-না-কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত [অনুচ্ছেদ ২৪৪(১)]। এই বিশেষ ব্যবস্থা করার কারণ সম্ভবত এই অঞ্চলগুলির মানুষের অনগ্রসরতা। সংসদের বিধিপ্রণয়ন সাপেক্ষে কোনো অঞ্চলকে 'তফসিলী অঞ্চল' বলে ঘোষণা করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়েছে [পঞ্চম তফসিল, প্যারা ৬-৭]। রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা অনুসারে ১৯৫০ সালের তফসিলী অঞ্চল আদেশ জারি করেন। অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে[১] এই অঞ্চলগুলিতে 'তফসিলী উপজাতি' বলে উল্লিখিত উপজাতিদের বাস। এই অঞ্চলগুলির প্রশাসনের জন্য পঞ্চম তফসিলে বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।

তফসিলী অঞ্চল

অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা[২] ও মিজোরাম রাজ্যের উপজাতি অঞ্চলগুলির জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে [অনুচ্ছেদ ২৪৪(২)] এবং ঐ অঞ্চলগুলির প্রশাসনের বিধান সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে পাওয়া যাবে।

উপজাতি অঞ্চল

পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত শাসনপ্রণালী সংক্ষেপে এইরকম —

১. সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের তফসিলী অঞ্চল ও তফসিলী উপজাতির প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। এই তফসিলে প্রশাসনের যেসব ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল :

অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের তফসিলী অঞ্চলের শাসনপ্রণালী

কেন্দ্রের নির্বাহিক ক্ষমতা বিভিন্ন রাজ্যকে স্ব স্ব তফসিলী অঞ্চলগুলির প্রশাসনের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া পর্যন্তই প্রসারিত হবে [পঞ্চম তফসিল, প্যারা ৩]। উপজাতি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে এবং রাজ্যপাল রাজ্যের তফসিলী উপজাতিদের কল্যাণ ও উন্নতি সংক্রান্ত যেসব বিষয় ঐ পরিষদের কাছে পাঠাবেন, পরিষদ সেইসব বিষয়ে উপদেশ দেবে [পঞ্চম তফসিল, প্যারা ৪]।

রাজ্যপালকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, সংসদের বা রাজ্য বিধানমণ্ডলের কোনো বিশেষ আইন কোনো তফসিলী অঞ্চলে প্রয়োজ্য হবে না অথবা কেবল ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রয়োজ্য হবে বলে তিনি নির্দেশ দিতে পারবেন। রাজ্যপালকে এই অধিকারও দেওয়া হয়েছে যে, তিনি তফসিলী উপজাতিদের দ্বারা বা তফসিলী

উপজাতিদের মধ্যে জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, জমি বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং তেজারতী কারবার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রনিয়ম প্রণয়ন করতে পারেন। রাজ্যপাল এই ধরনের কোনো প্রনিয়ম প্রণয়ন করলে তাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি দরকার হবে [পঞ্চম তফসিল, প্যারা ৫]।

তফসিলী অঞ্চল ও তফসিলী উপজাতিদের প্রশাসন সম্পর্কে সংবিধানের এই ব্যবস্থাগুলি সংসদ সাধারণভাবে বিধি প্রণয়ন করে পরিবর্তন করতে পারে এবং তা পরিবর্তন করার জন্য সংবিধানসংশোধনের আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না [পঞ্চম তফসিল, প্যারা ৭(২)]।

সংবিধানে বিভিন্ন রাজ্যের তফসিলী অঞ্চলগুলির প্রশাসন ও তফসিলী উপজাতিদের কল্যাণ সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রপতি যে কোনো সময়ে এই কমিশন নিয়োগ করতে পারেন, তবে সংবিধান প্রবর্তিত হবার পর থেকে ১০ বছরের শেষে এইরকম কমিশন নিয়োগ বাধ্যতামূলক [অনুচ্ছেদ ৩৩৯(১)]। সেই অনুসারে ১৯৬০ সালে ঢেবরকে সভাপতি করে একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়। সেই কমিশন ১৯৬১ সালের শেষাশেষি রাষ্ট্রপতির কাছে তার রিপোর্ট পেশ করে।

২. অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের উপজাতি অঞ্চলগুলি সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের প্যারা ২০-র নিচে এক সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সারণী কয়েকবারই সংশোধন করা হয়েছে। মূলে এই সারণীতে দুটি ভাগ ছিল — ক এবং খ। নাগাল্যান্ড রাজ্য সৃষ্টির পর (১৯৭২, ১৯৮৪ ও ১৯৮৮ সালে যথাসংশোধিত) এই সারণীতে ৪টি ভাগে ৯টি অঞ্চল আছে :

অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের উপজাতি অঞ্চল

ভাগ ১ — (১) উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা, (২) কার্বি আংলং জেলা।

ভাগ ২ — (১) খাসী পার্বত্য জেলা, (২) জৈন্তিয়া পার্বত্য জেলা, (৩) গারো পার্বত্য জেলা (মেঘালয়ে)।

ভাগ ২ক — (১) ত্রিপুরা উপজাতি অঞ্চল জেলা।

ভাগ ৩ — (১) চাকমা জেলা, (২) মাম্মা জেলা, (৩) লই জেলা।

ভাগ ২ক ১৯৮৪ সালের সংবিধান (৪৯তম সংশোধন) আইনে যোগ করা হয়।

অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম[১] ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের তফসিলী অঞ্চলগুলির প্রশাসন সম্পর্কে পঞ্চম তফসিলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে আর ষষ্ঠ তফসিলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম[২] রাজ্যের উপজাতি অঞ্চলগুলির প্রশাসন সম্পর্কে।

এই উপজাতি অঞ্চলগুলি শাসিত হবে স্বশাসিত জেলা হিসাবে। এই স্বশাসিত জেলাগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্বাহিক প্রাধিকারের বাইরে নয়, কিন্তু কতকগুলি বিধানিক ও বিচারিক কর্মসম্পাদনের জন্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পরিষদগুলি মুখ্যত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা। তাদের কতকগুলি বিশেষ

ক্ষেত্রে বিধিপ্রণয়নের[৩] ক্ষমতা আছে, যেমন — সংরক্ষিত বন ছাড়া অন্যান্য বন পরিচালন, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ ও সামাজিক প্রথা। রাজ্যপাল এই পরিষদগুলিকে কোনো কোনো মামলা বা অপরাধের বিচার করার ক্ষমতাও অর্পণ করতে পারেন।[৪] এই পরিষদগুলির ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করার এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট কর ধার্য করার ক্ষমতাও আছে। তবে এই পরিষদগুলি কর্তৃক প্রণীত কোনো বিধি রাজ্যপালের সম্মতি না পেলে কার্যকর হবে না।

জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদকে যেসব বিষয়ে বিধিপ্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেইসব বিষয়ে রাজ্য বিধানমণ্ডলের আইন এই অঞ্চলগুলিতে প্রসারিত হবে না কি-না সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ সরকারী বিজ্ঞপ্তিপত্র মারফৎ সেই মর্মে নির্দেশ দেয়।[৫] অন্যান্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি আর রাজ্য আইনের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল এই নির্দেশ দিতে পারেন যে, সংসদের বা রাজ্য বিধানমণ্ডলের কোনো আইন কোনো শাসিত জেলায় প্রয়োজ্য হবে না অথবা তিনি তাঁর বিজ্ঞপ্তিতে যেরকম নির্দিষ্ট করবেন, কেবল সেইরকম ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রয়োজ্য হবে।

এই পরিষদগুলির হাই কোর্টের এক্তিয়ার সাপেক্ষে এমনসব দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করার ক্ষমতাও থাকবে যা রাজ্যপাল সময়ে সময়ে নির্দিষ্ট করবেন।

নির্দেশিকা

1. ১৯৮৪ সালে এই রাজ্যগুলি ছিল — অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, গুজরাত, হিমাচল প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও রাজস্থান (ইন্ডিয়া ১৯৮৪, পৃ. ১৫২)।
2. ১৯৭১ সালের উত্তর-পূর্বাঞ্চল (পুনর্গঠন) আইনে মেঘালয়কে এর সঙ্গে যোগ করা হয়, ত্রিপুরাকে যোগ করা হয় ১৯৮৪ সালের সংবিধান (৪৯তম সংশোধন) আইনে আর মেঘালয়কে যোগ করা হয় ১৯৮৬ সালের মিজোরাম রাজ্য আইনে।
3. প্যারা ৩, ষষ্ঠ তফসিল।
4. প্যারা ৪, ষষ্ঠ তফসিল।
5. প্যারা ১২, ১২ক, ১২কক ও ১২খ, ষষ্ঠ তফসিল।